গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৬ - ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পাশফেল তুলে দেওয়া ও ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল কলকাতা

এ এক অন্য মিছিল। এগিয়ে চলেছে রাজপথের দুই প্রান্ত প্লাবিত করে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চকিত স্লোগানের আওয়াজ কাঁপিয়ে তুলছে রাজধানীর বাতাস। তাদের দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফুটে উঠছে এমন এক চেতনাবোধ যা সঞ্চারিত হচ্ছে দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে। এরা তো তাঁদেরই সন্তান। সন্তানের ভবিষ্যৎ তো তাঁদেরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই ছাত্ররা সামিল হয়েছে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদে, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। শিক্ষা মরলে মরবে চেতনা, মরবে মনুষ্যত্ব। চেতনাবিহীন, মনুষ্যত্বহীন মানুষ তো আসলে মানুষ নামেরই যোগ্য নয়।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্তরে স্তরে ফি-বৃদ্ধি করা হচ্ছে বিপুল হারে। শিক্ষার

গুজব ছড়িয়ে আন্দোলনে কালিমালেপনের গভীর ষড়যন্ত্র

সামগ্রিক বেসরকারিকরণের সুচতুর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়ে ইতিমধ্যেই এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি ধসিয়ে দিয়েছে সিপিএম সরকার। গড়ে উঠেছে সমান্তরাল বেসরকারি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিলে প্রাথমিক শিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষাও চলে যাবে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের হাতে। বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে, এমনকী মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি বলতেও তাদের কিছু গড়ে উঠবে না। এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই এ আই ডি এস ও রাজ্য কমিটি উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার। যার অংশ হিসাবেই সংগঠিত হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল সমীপে ছাত্রবিক্ষোভ মিছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত প্রতিবাদপত্র পাঠাতেই এ দিন কলকাতায় জমায়েত হয়েছিল ছাত্ররা।

এই বিশাল ছাত্রমিছিল দু-এক দিনের প্রস্তুতিতে গড়ে উঠতে পারে না। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন, মালদা থেকে পুরুলিয়া এরই প্রচার-প্রস্তুতি চলেছে লাগাতার। হাজার হাজার হ্যান্ডবিল, বুলেটিন,

তিনের পাতায় দেখুন

অন্যায়ের প্রতিবাদে যুগে যুগে ছাত্ররাই অগ্রণী সৈনিক

বেশ কিছুদিন যাবৎ বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক স্বার্থান্বেষী মহল ও শাসক দলগুলির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনবিরোধী একটা মানসিকতা তৈরি করার পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। আন্দোলন করলে, কারখানা বন্ধ করলে, মিছিল-মিটিং-অবরোধ করলে মানুষের কত অসুবিধা হয় খবরের কাগজে, বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে তার ফিরিস্তির কোনও বিরাম নেই। এ ক্ষেত্রে সিপিএমের ৩৪ বছরের অপশাসন বামপন্থী রাজনীতিকে মানুষের চোখে যেভাবে নামিয়ে দিয়েছে, তাকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এরা ব্যবহার করছে। সমাজমননে এই বিরক্তি, বিরুদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে শাসকশ্রেণী সাধারণভাবে সবরকম রাজনীতি বিশেষ করে আন্দোলনমুখী বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কেই জনমনকে বিষিয়ে তুলতে চাইছে। পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, যত কারখানা বন্ধ হচ্ছে, চাকরি হারিয়ে শ্রমিকরা যত পথে বসছে, বেকারি যত বাড়ছে, ফসলের দাম না পেয়ে চাষি যত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য সহ বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি ক্রমাগত দুর্লভ হওয়ার ফলে মানুষের ক্ষোভ যত তীব্র হচ্ছে তথাকথিত শ্মশানের শান্তি বজায় রাখতে শাসকগোষ্ঠী তত আন্দোলনবিরোধী জিগির তুলছে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাতে সামিল করতে চাইছে। সম্প্রতি ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র মিছিলে একটি স্কুলের ছাত্রদের যোগদান নিয়ে পরিকল্পিত বিরুদ্ধপ্রচার এই সামগ্রিক চক্রান্তেরই অঙ্গ।

একদিন এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকরা বলেছিল, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়। তারা কার্লাইল সার্কুলার জারি করেছিল এই মর্মে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি। ব্রিটিশ শাসকদের বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, গভর্নমেন্ট কি আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেতনার পাহারাদার হবে। প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট অ্যাটেনমেন্ট অব স্বরাজ ক্যান নট।' দেশবন্ধুর এই আহ্বানে সেদিন দলে দলে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আজ প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ছাত্রদের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করার সময়ে কার অনুমতি নিয়েছিলেন? ব্রিটিশ প্রশাসকদের? ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর, সূর্য সেন কার অনুমতি নিয়েছিলেন? তাঁদের দলের ছেলেরা কি অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন? ভগৎ সিং বাবার মতামত উপেক্ষা করে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে মতবিরোধের কথা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনেই নয়, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে '৫৩ সালে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, '৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন, '৫৩ সালে বঙ্গবিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতে এইসব প্রশ্ন তোলার সাহস কেউ পায়নি।

আন্দোলন করলে মানুষের অসুবিধা হয়, আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই অজুহাতও নতুন নয়।

চারের পাতায় দেখুন

বন্দিমুক্তির দাবিতে জয়নগরে বিশাল কনভেনশন

রাজ্যে সিপিএম শাসনে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দেওয়া, বিচারের প্রহসনে জেলে ভরা একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। রাজ্যের জেলগুলিতে আটক তাই শত শত রাজনৈতিক বন্দি। মিথ্যা মামলা ঝুলছে কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই তাই বন্দিমুক্তির দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বন্দিমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি মতো বন্দিমুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন এবং গণতান্ত্রিক ভাবনার মানুষরা।

২৭ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বন্দিমুক্তি কমিটি ও সিপিডিআরএস যৌথভাবে এক নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করেছিল। সেখানে দু'হাজারেরও বেশি মানুষ ন'বারের বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে সমবেত হয়েছিলেন জয়নগরের শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দ্রুত বন্দিমুক্তির দাবিতে আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সিপিডিআরএসের জেলা আহ্বায়ক শ্যামল প্রামাণিক।

প্রস্তাবের সমর্থনে বন্দিমুক্তি কমিটির জেলা সম্পাদক সুবীর দাস বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে কংগ্রেস আমল এবং পরবর্তীকালে সিপিএম শাসনেও বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়নের শিকার। প্রবোধ পুরকাইত এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রথম সারিতে ছিলেন। তাই সিপিএম সরকার তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করেছে। তিনি সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে দেখান যে, বন্দিমুক্তির বিষয়টি সরকারের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভর করছে।

জয়নগরের বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, যে বন্দিদের নাম এখানে আলোচিত হচ্ছে তাঁরা সকলেই শাসকদলের ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি আলোচনায় দেখান কীভাবে কংগ্রেস ও সিপিএম বন্দিমুক্তির বিরোধিতা করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, পতিত পাবন হালদার, ছত্রধর মাহাতো, সুশীল রায় সহ আরও অনেক বন্দি রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা প্রবোধ পুরকাইত সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাব। সরকারের উদ্যোগে গঠিত বন্দিমুক্তি রিভিউ কমিটির অন্যতম সদস্য সুজাত ভদ্র বলেন, রাজবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রবোধবাবু সহ সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দিদের মুক্তির সম্ভাবনাও প্রবল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে প্রায় আট হাজার মানুষের নামে মিথ্যা কেস হয়েছে, রিভিউ কমিটি সেগুলি থেকে তাঁদের মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বন্দিমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করার কথা বলেন। আবৃত্তি শিল্পী রূপশ্রী কাহালি বলেন, যদি প্রয়োজন হয় বন্দিমুক্তির জন্য নতুন সরকারকে আইন পাল্টাতে হবে। শিক্ষক অসীম গিরি বন্দিমুক্তি আন্দোলনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকেও সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। প্রখ্যাত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায় মূল প্রস্তাবের সাথে সহমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নতুন সরকার শহরের সৌন্দর্যায়নের কথা বলছে, কিন্তু সমাজেরও সৌন্দর্যায়ন প্রয়োজন। হাজার হাজার নিরপরাধ বন্দিকে জেলখানায় রেখে সেই সৌন্দর্যায়ন সম্ভব নয়। তাঁদের মুক্ত আকাশের নিচে নিয়ে আসা হোক। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত বলেন, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতে সিপিএম অপশাসনের পরিবর্তন হয়েছে। সিপিএম আমলে যে সব জেলায় মারাত্মক অত্যাচার হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা তার অন্যতম। এটা বিস্ময়কর যে একটা দলের ৪৯ জন নেতা ও কর্মী যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত, ১৫২ জন খুন হয়েছেন, ২০০০-এর বেশি কর্মী বিচারাধীন! রাধাবল্লভপুরের ঘটনার ধারে-কাছে প্রবোধবাবু ছিলেন না। ঘটনার পর তৎকালীন সাংসদ সনৎ মণ্ডল, রাজ্যসভার সাংসদ দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এবং আরএসপি ও বিজেপি নেতারা এলাকা পরিদর্শন করে এসে জানিয়েছিলেন, প্রবোধবাবু ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নন, এমনকী তিনি লোয়ার কোর্টে বেকসুর খালাস হলেন, অথচ সরকার সেই কেস হাইকোর্টে নিয়ে গিয়ে তিনদিনের বিচারেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করাল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সমাজকর্মী দিলীপ চক্রবর্তী।

হাসপাতালের নার্সরাও রাজপথে নামতে বাধ্য হলেন

মিছিল, কলকাতা শহরের বুকে কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু গত ২ সেপ্টেম্বর একেবারে অন্য ধরনের একটি মিছিল প্রত্যক্ষ করল শহরের রাজপথ। সাদা অ্যাপ্রন পরা শত শত নার্স পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে চলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেবেন তাঁরা। হাতে তাঁদের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান। শিয়ালদহের এন আর এস হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে মিছিল চলেছে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের দিকে। এঁদেরই তো দেখা যায় সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, সারি সারি শায়িত রোগীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। কোনও রোগীকে সাহস জোগাচ্ছেন, কাউকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন, প্রেসার মাপছেন, আবার কখনও বা ভিজিটে আসা ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করছেন রোগীদের সমস্যা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে। মুখে-চোখে অত্যধিক পরিশ্রমের স্পষ্ট ছাপ, কারওর রাতজাগা চোখের নিচে কালির ছোপ।

হাসপাতাল চত্বর ছেড়ে এঁরা আজ মিছিলে কেন? প্রশ্ন ছিল পথচলতি মানুষের চোখে। উত্তর মিলল দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ডে, ব্যানারে, মহান সেবাব্রতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ছবিতে সুসজ্জিত ট্যাবলোর বয়ান থেকে।

মূলত কাজের অমানুষিক চাপ ও কর্মক্ষেত্রের অসহনীয় পরিবেশ দূর করার দাবিতেই তাঁদের এই প্রতিবাদ মিছিল। সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত ৩০ হাজার নার্স দিনের পর দিন চরম বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হয়ে কাজ করে চলেছেন। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ ওয়ার্ডে প্রতি শিফটে তিনজন রোগী পিছু একজন এবং বিশেষ ওয়ার্ডে একজন রোগী পিছু একজন নার্স থাকার কথা। পূর্বতন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে নিয়োগ প্রায় না হওয়ার কারণে হাসপাতালগুলিতে নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যে কী চূড়ান্ত রকমের কম, ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রই তা জানেন। প্রবল কাজের চাপ সহ্য করে সরকারি হাসপাতালগুলির ব্যাপক অব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হয় নার্সদের। এই অবস্থায় বহু ক্ষেত্রেই রোগীদের তাঁরা উপযুক্ত মানের সেবা-শুশ্রূষা দিতে পারেন না। রোগীদের পরিবার-পরিজনদের ক্ষোভ-রোষের শিকার হতে হয় তাঁদের। শুধু তাই নয়, কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেলে অনেক সময়ই কর্তৃপক্ষ তার দায় নার্সদের উপরেই চাপিয়ে দেয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রের সরকারি কর্মচারীরা যেখানে সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা করে ডিউটি করেন, সেখানে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নার্সিং স্টাফরা কাজ করেন সপ্তাহে ৪৫-৫৫ ঘন্টা। শুধু তাই নয়, প্রতি ৯ থেকে ১৫ দিন অন্তর পর পর তিনদিন তাঁদের নাইট ডিউটি করতে হয়। তিন রাতের কঠিন ধকলের পর নাইট ডিউটির সপ্তাহে তাঁদের বিশেষ ছুটিও দেওয়া হয় না। সংসার ও সন্তানের দায়দায়িত্ব বহন করে বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের অমানুষিক পরিশ্রম নার্সদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে।

এর সঙ্গে রয়েছে বেতন বৈষম্য। ১৯৭০-এর বেতনক্রমে ডিপ্লোমা হোল্ডার নার্সিং কর্মচারীরা রাজ্যের অন্যান্য ডিপ্লোমা-হোল্ডার সরকারি কর্মচারীদের সমান বেতনক্রম পেতেন। কিন্তু পূর্বতন সিপিএম ফ্রন্টের আমলে ১৯৮১ সালের দ্বিতীয় বেতন কমিশন থেকে পঞ্চম বেতন কমিশন পর্যন্ত কোনও কমিশনই ডিপ্লোমা হোল্ডার নার্সিং কর্মচারীদের জন্য রাজ্যের অন্যান্য ডিপ্লোমা হোল্ডার কর্মচারীদের সমান বেতন কাঠামোর সুপারিশ করেনি। ফলে, স্তরে স্তরে বিভিন্ন গ্রেডে সৃষ্টি হয়েছে বেতন বৈষম্য। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কাজে সম দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের জি এন এম ও অন্যান্য নার্সিং কর্মচারীরা কেন্দ্রের নার্সিং কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর তুলনায় অনেক কম বেতনে কাজ করছেন। এই অন্যায্য নিয়মের এখনও কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এই অসহনীয় পরিস্থিতিই পথে নামতে বাধ্য করেছে সরকারি হাসপাতালের নার্সদের। তাঁরা গড়ে তুলেছেন সংগ্রামী সংগঠন 'নার্সেস ইউনিটি'। ২ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সম্পাদিকা পার্বতী পালের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেন। তাঁদের প্রধান দাবিগুলি হল, নাইট ডিউটির সপ্তাহে সাপ্তাহিক ছুটি সহ বিশেষ ছুটি 'নাইট অফ' আবশ্যিক করতে হবে এবং ৫০ বছর ও তার বেশি বয়সী নার্সিং স্টাফদের নাইট ডিউটি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই তিন সপ্তাহের কম সময়ের ব্যবধানে নাইট ডিউটি দেওয়া চলবে না। নার্সদের কাজের সময় অন্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টার মধ্যে রাখতে হবে। এ এন এম (আর) নার্সিং কর্মচারীদের নার্সিং ক্যাডারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে ও সেই অনুযায়ী যথাযথ বেতন কাঠামো নির্ধারিত করতে হবে এবং প্রত্যেক নার্সিং কর্মচারীকে দু বছরের উপযুক্ত 'ইনসার্ভিস' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জি এন এম পদে উন্নীত করার সুযোগ দিতে হবে। কেন্দ্রের অধীনে কর্মরত নার্সিং কর্মচারীদের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশকৃত বেতন-কাঠামোর অনুরূপ বেতন-কাঠামো রাজ্যের সর্বস্তরে নার্সদের দিতে হবে।

এদিন নার্সেস ইউনিটির পতাকাতলে পাঁচ শতাধিক নার্সিং কর্মচারীর সুসজ্জিত মিছিলটি মেট্রো চ্যানেলে পৌঁছলে সেখানে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নার্সদের বিবিধ সমস্যা ও দাবিগুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদিকা ভাস্বতী মুখার্জী। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এ এন এম (আর) নার্সিং কর্মচারীদের প্রতিনিধি রেখা মান্না প্রমুখ। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত নার্সেস ইউনিটির এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে নার্সিং পরিষেবার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলির অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্তও বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা নার্সিং পেশার বিবিধ সমস্যা ও সরকারি হাসপাতালগুলির অপ্রতুল পরিকাঠামো সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। কর্মক্ষেত্রের অসহনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ও ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে উপস্থিত নার্সিং কর্মচারীদের দৃঢ় শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাবেশ শেষ হয়।

কোচবিহারে পরিচারিকাদের বিক্ষোভ

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, বিপিএল তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণ, পরিচয়পত্র, ন্যূনতম বেতন, সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান, বার্ধক্যভাতা প্রভৃতির দাবিতে ৩০ আগস্ট সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে হলদিবাড়ি ব্লক অফিসে ২৫০ জন পরিচারিকা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এরপর কোচবিহার মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করার পর কাছারি মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন যুথিকা নাথ, ফিরোজা আহমেদ।

শিক্ষার সর্বনাশ রুখতে পিতা-মাতারা সন্তানদের পাঠিয়েছেন এই মিছিলে, শিক্ষকরা উৎসাহ দিয়েছেন

একের পাতার পর

পোস্টার ছাত্রসংগঠকরা ছড়িয়েছে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। স্কুল-কলেজ থেকে ডি এস ও সদস্য সংগ্রহ করেছে। সেমিনার, বৈঠক ও সম্মেলন করে ছাত্র কমিটি গঠন করেছে। স্কুলে কলেজে ছাত্ররাই উদ্যোগ নিয়ে চাঁদা তুলে বাস-ট্রেনের ভাড়া সংগ্রহ করেছে কলকাতায় আসার জন্য। কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতে গেলেই দেখা যেত, দূরের জেলাগুলি থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরাই কীভাবে সংগঠকদের সাহায্য পরামর্শে চিঁড়ে-মুড়ি-রুটি নিয়ে এসেছিল। এটাই যথার্থ ছাত্র আন্দোলনের রীতি ও রেওয়াজ।

ডি এস ও কেবল ছাত্রদের মাঝেই যায়নি। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে, শিক্ষার দাবিতে এমন গুরুতর একটি ছাত্র আন্দোলন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমর্থনেই যথার্থ শক্তিশালী রূপ পেতে পারে। সেজন্যই শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে লিখিত আবেদনপত্র পৌঁছে দিয়েছিল তারা। এ বার লক্ষণীয়ভাবে শিক্ষক ও অভিভাবকরা সাড়া দিয়েছেন ব্যাপক। বোঝা যায়, এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের দ্বারা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার যে সর্বনাশা পরিণাম ঘটেছে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষক ও অভিভাবকরা গোড়াতেই সজাগ ও সতর্ক হয়েছেন, আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেরাই ছাত্র ও সন্তানদের উৎসাহিত করেছেন মিছিলে যোগ দিতে। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় তাঁদের এই সচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাজ্যের লক্ষ লক্ষ অভিভাবকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা অবাস্তব বিষয়। সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কিন্তু সর্বনাশা শিক্ষানীতির কথা অভিভাবকরা জেনেছেন, তার বিরুদ্ধে ডি এস ও-র আন্দোলনের কথাও শুনেছেন। নানাভাবে ডি এস ও-র আবেদনপত্র পৌঁছেছে তাঁদের কাছে। ছাত্ররা তো বটেই, শিক্ষক অভিভাবকদেরও সাড়া এবার যে রকম ছিল তাতে ছাত্র জমায়েত অনায়াসেই ৫০ হাজার ছাড়াতে পারত যদি এই সময় স্কুলগুলিতে ইউনিট টেস্ট এবং গ্রামবাংলায় বর্ষার প্রকোপ না থাকত। দূর-দূরান্তের এমন গ্রামগঞ্জ থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল যে দূরত্ব পার হতে সময় লাগে এক থেকে দু'দিন। এই অবস্থায় অভিভাবকদের অজান্তে বা সম্মতি ছাড়া দলে দলে স্কুলছাত্রদের পক্ষে মিছিলে আসা যে সম্ভব নয়, এ কথা বুঝতে সমীক্ষার দরকার হয় না। ডি এস ও-র প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসই অভিভাবকদের সন্তানদের পাঠাতে ভরসা দিয়েছে। মিছিলে আসা সকল স্কুলের ছাত্রদেরই ডি এস ও সংগঠকরা দায়িত্বের সাথে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

বহু গৌরবময় ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান কলেজ স্ট্রিট। ওখানেই আধুনিক শিক্ষার রূপকার বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে মিছিল যখন ঢেউয়ের মতো ধর্মতলায় পৌঁছাল, তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল, 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' কিন্তু তাই বলে শৃঙ্খলার সামান্য বিচ্যুতিও কোথাও ছিল না। কলেজ স্কোয়ারের বিশাল জমায়েতে যখন ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য রাখছিলেন, তখন একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালে ছাত্ররাই তার পথ করে দিয়েছে। আর এ কিদোয়াই রোড থেকে মিছিল এস এন ব্যানার্জী রোডে ঢোকার মুখে দূরে দমকলের ঘণ্টা শুনেই মিছিল থেমে গেছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে দমকলের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারপর মিছিল এগিয়েছে। এই নৈতিকতা ও সংস্কৃতিই ডি এস ও-র বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মিছিলে সামিল ছাত্ররা জানতেও পারেনি ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত কায়েমি স্বার্থবাদী মহল যে কোনও উপায়ে এই মিছিলের গুরুত্বকে খাটো করার জন্য ও গোটা আন্দোলনেই কালিমা লেপে দেওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা বেছে নিয়েছিল কলকাতার নিউ আলিপুর এলাকার একটি স্কুলকে। জানা গেল, মিছিলে আসা ছাত্রদের বাড়ি গিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা অভিভাবকদের বলেছে, আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে (দি টেলিগ্রাফ, ৯.৯.'১১)। শুধু একজন নয়, বাড়ি বাড়ি ও গোটা পাড়ায় রটিয়ে দেওয়া হয় এই গুজব। স্বাভাবিকভাবেই এই সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। অতি দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলেন শাসক দলের দুই বিধায়ক, সঙ্গে পেটোয়া কিছু ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যম। একদল লোক চড়াও হল স্কুলে, ভাঙচুর চালাল। হেনস্থা করা হল, এমনকী শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হল এক শিক্ষককে। থানায় ডায়েরি করা হল, এমনকী হাইকোর্টে অন্য মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে এই ঘটনাকেও জুড়ে দেওয়া হল।

এরা কারা? স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরাসরি বিভিন্ন চ্যানেলে বললেন, যারা স্কুলে চড়াও হয়েছিল, ভাঙচুর করল, তারা কেউ অভিভাবক নয়। প্রচার হতে থাকল ওই স্কুলের অনেক ছাত্রকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় তারা গেছে কেউ নাকি জানে না। অথচ ঘটনা হল, সাত দিন ধরে ওই স্কুলে ডি এস ও কর্মীরা প্রচার করেছে, ৮ সেপ্টেম্বর সকালে স্কুলের সামনে থেকেই গাড়িতে উঠেছে ছাত্ররা। কোথাও কোনও ফিসফাস বা গোপনীয়তা ছিল না, তার কোনও প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। ফলে অনেকেই জানত, ডি এস ও-র ব্যানার লাগানো গাড়িতে এই স্কুলের ছাত্ররা আরও বহু স্কুলের ছাত্রদের সাথেই মিছিলে গেছে। ফলে 'জানা নেই', 'রহস্যজনক' ইত্যাদি যে সব বাছা বাছা বিশেষণ সেদিন ব্যবহার করা হয়েছে, তা যে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবেই করা হয়েছে তা ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না।

এরপর আন্দোলনবিরোধী প্রচারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। অপহরণের গল্প ফেঁদে যাদের নিখোঁজ বলা হচ্ছিল সেই সমস্ত ছাত্ররা যখন বাকি সব ছাত্রের মতোই বাড়ি ফিরে গেল, তখন আবার এই বলে প্রচার শুরু করা হল যে, স্কুলছাত্রদের মিছিলে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এ আই ডি এস ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যাঁরা এ ভাবে ভাবছেন তাঁদের বিনয়ের সঙ্গে আমরা এ রাজ্যে ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের কিছু দিক স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ক্ষমতায় এসে সিপিএম যখন প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ও পাশফেল তুলে দিয়েছিল, তখন এ আই ডি এস ও-ই একমাত্র ছাত্রসংগঠন যে এই শিক্ষানীতির সর্বনাশা পরিণাম উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তা প্রতিরোধে এক সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। ছাত্রসমাজের ব্যাপক সমর্থনে ১৯ বছর ধরে সেই সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতিহত করেছিল। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন, ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়, প্রতুল গুপ্ত, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেশ দে, সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুশীল কুমার মুখার্জী, উপাচার্য অরবিন্দ বসু প্রমুখ রাজ্যের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা সেদিন রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তাঁরা সভা করেছেন, মিছিল করেছেন, আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। সেদিনও 'আমরা ইংরেজি শিখতে চাই' এই ধ্বনি দিয়ে সামিল হয়েছিল হাজার হাজার প্রাথমিকের স্কুল ছাত্রছাত্রী। বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা কেউ সেদিন এ কথা বলেননি যে শিশু ছাত্রদের মিছিলে, অবস্থানে এনো না। এ কথা ঠিক যে, প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দিলে ভবিষ্যতে কী বিপুল ক্ষতির সামনে তাদের পড়তে হবে, পাশফেল উঠে গেলে শিক্ষার ভিত্তিটাই দুর্বল হয়ে যাবে, এ সব কথা বোঝার বয়স প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের নয়। এমনকী মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তরের ছাত্রছাত্রীরাই কি বুঝেছিলেন? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপকরাও কি বুঝেছিলেন? যে অভিভাবকরা আজ পথে ঘাটে কয়েক প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভিত্তি নষ্ট করার জন্য সিপিএম সরকারকে দায়ী করেন, তাঁরাও কি সেদিন প্রথমেই ধরতে পেরেছিলেন এই পরিণাম? সেই কারণেই তো ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা। যাঁরা বোঝেন, সমাজের প্রতি দায় অনুভব করেন, জ্ঞান-বিদ্যা-বিবেচনাকে সমাজের জন্য ব্যবহার করতে চান তেমন রাজনীতিক এবং দলই দায় বোধ করেন কোনও বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার। একটি যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ও তার ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও শুরুতেই সিপিএম সরকারের এই শিক্ষানীতির বিপদ ধরতে পেরেছিল বলেই সিপিএমের বিপুল লোকবল ও প্রচারের বাধাকে পেরিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেছিল প্রথমে। এই মতবাদিক বা আদর্শগত সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই শিশুরা রাস্তায় নেমে বলেছিল, 'আমরা ইংরেজি শিখতে চাই'। তাদের সামনে রেখে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন ভাষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন তাঁদের লক্ষ্য ছিল ছাত্রসমাজ, ব্যাপক অভিভাবক ও নাগরিক সমাজের প্রতি। দশ বছর পর এর বিষময় ফলাফল হাতেনাতে পেয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও যখন পথে নামলেন তখনই ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক আন্দোলন ব্যাপক রূপ পেল, যা মাথা নত করতে বাধ্য করেছে উদ্ধত সিপিএমকে।

শিক্ষার দাবিতে মিছিলে স্কুল পড়ুয়াদের আসা উচিত কি অনুচিত সেই বিতর্কে আমরা ভেবে দেখতে বলব, বিভিন্ন কোম্পানি তাদের নানারকম পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপনে যখন অবিরাম শিশুদের ব্যবহার করে যায়, কিশোর কিশোরীদের পত্রিকার নামে যারা অশ্লীলতার ব্যবসা করে, কি শোব - কিশোরীদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে, এ দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু পথেঘাটে ভিক্ষা করে ফেরে, পিতামাতাকে হারিয়ে অনাথ আশ্রমের অন্ধকারে ঠাঁই নেয় যাদের প্রশ্রয়ে, অপরাধী তারা নয়, অপরাধী হল ডি এস ও-র মতো ছাত্র সংগঠন। কারণ ডি এস ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলদের শিক্ষা ও বাণীকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরে চরিত্র গঠনে জোর দেয় ও যুগোপযোগী বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে ছাত্রদের সংগঠিত করে শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে দিনরাত গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের সচেতন করে।

ডি এস ও-র বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক প্রচারে এমন অভিযোগও আনা হয়েছে যে, ডি এস ও খাবারের লোভ দেখিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে, চিড়িয়াখানা দেখানোর নাম করে ছাত্রদের মিছিলে নিয়ে এসেছে। এভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ হাজার ছাত্রকে কলকাতায় মিছিলে আনা যায় কি না, তা বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান রাজ্যের মানুষের আছে। দ্বিতীয়ত, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ছাত্র সংগঠন হিসাবে এ আই ডি

চারের পাতায় দেখুন

৬ সেপ্টেম্বর কলিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কালা সার্কুলার পোড়াচ্ছে

এই আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রদের ভবিষ্যত যুক্ত

তিনের পাতার পর

এস ও-কে যাঁরা জানেন, তাঁরা এটাও জানেন যে, গোটা দেশজুড়ে দক্ষিণ-বাম নির্বিশেষে ছাত্র আন্দোলনে যে আপস, নীতিহীনতা, ভ্রষ্টাচারের স্রোত বয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে উন্নত নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে একটা সত্যিকারের বলিষ্ঠ রাজনীতিকে এ আই ডি এস ও তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যে রাজনীতি দেশের সম্পত্তি লুঠ করতে শেখায় না, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে শেখায়, লোভী, আত্মসর্বস্ব হওয়ার পরিবর্তে সৎ, উদার হতে শেখায়, নোংরা অপসংস্কৃতির শিকার না হয়ে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে লড়তে শেখায়, যারা ছাত্রদের শুধু টাকা রোজগারের যন্ত্র হিসাবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য মনীষী-বিপ্লবী-বড় মানুষদের জীবন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে, তারা কি খাবারের লোভ দেখিয়ে, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে ছাত্রদের আন্দোলনের ময়দানে নিয়ে যেতে পারে? আসলে এ সব অভিযোগ তোলার দ্বারা কায়েমি স্বার্থবাদীরা, নীতিহীন রাজনীতির লোকেরা রাজনীতির মধ্যে নীতির ভূমিকাকে খাটো করতে চায়। দেখাতে চায় সব রাজনীতিই সমান। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। ছাত্রস্বার্থ তথা জনস্বার্থের যথার্থ লড়াইয়ের উপর এ এক মারাত্মক আক্রমণ।

এই কায়েমি স্বার্থবাদীরা ভুলিয়ে দিতে চায় যে, শুধু শিক্ষা আন্দোলনেই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণআন্দোলনেই সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে কিশোর-ছাত্ররাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরাধীন ভারতে যে মহান আত্মদান গোটা জাতির ঘুম ভাঙিয়েছিল সেই ক্ষুদিরামের তো মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়েছিল ১২-১৩ বছর বয়সেই। আবার তাঁর ফাঁসির তিন বছর পর ১১ আগস্ট কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে যে ছাত্রটি গোটা স্কুলে উপবাসের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই ছাত্রটিই তো পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বাল্যকালের এই অভিষেক ছাড়া কি তাঁকে আমরা এমন করে পেতাম? এমন কোনও কৃতঘ্ন কি দেশে আছে, যে বলবে সেদিন তাঁরা ভুল করেছিলেন? জালালাবাদের পাহাড়ে মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে অসম লড়াই গড়ে তুলেছিলেন তাতে যে বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই টেগরাদের দেশাত্মবোধের সাথে কি নীতিহীন, ভ্রষ্টাচারীদের কোনও তুলনা চলে? মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না। তোমাদের মতো কিশোর বয়স্কদেরও না। এগজামিনে পাশ করা দরকার,— এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙ্গার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।" শরৎচন্দ্র কি ভুল বলেছিলেন? স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিভূ নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা, এই বচনের দোহাই দিয়ে ছাত্রদের দেশের কাজ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হতে পারে না। অধ্যয়ন মানে কতকগুলি গ্রন্থপাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ— এর দ্বারা মানুষ হয়ত স্বর্ণপদক লাভ করতে পারে, হয়ত বড় চাকরি পেতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না।" নেতাজি কি দেশের ছাত্রদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন? ছাত্রদের মিছিলে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন বলে শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন কোনও কোনও অতি উৎসাহী। তবে তো শিক্ষক সত্যেন বোস, বেণীমাধব দাস, মাস্টারদা, যাঁরা এই কিশোর বিপ্লবীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদেরও দোষী সাব্যস্ত করতে হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও প্রতিটি গণআন্দোলনে ছাত্র-কিশোররা কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি? ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত দুই শহিদ নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত তো স্কুলছাত্র ছিলেন। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর দাবিতে আন্দোলনে শিশু-কিশোরদের ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। সদ্য যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে দীর্ঘ সিপিএম অপশাসনের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীরা সামনের সারিতে থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। ধর্ষিতা যে তাপসী মালিকের মৃত্যু শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল, তিনি তো স্কুলছাত্রী ছিলেন। এ ছাড়াও সেখানকার স্কুল ছাত্রছাত্রীরা লাগাতার অবস্থান-বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। যে নন্দীগ্রাম আন্দোলন সারা দেশে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে

পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে, এ রাজ্যে পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, সেই আন্দোলনের শহিদদের অন্যতম বিশ্বজিৎ মাইতি, ইমদাদুল হক স্কুলের ছাত্র ছিলেন। লালগড়ে যৌথবাহিনীর অত্যাচার কীভাবে সেখানে স্কুল ছাত্রদের পড়াশোনাকে লাটে তুলেছিল তা কারও অজানা নয়। স্কুল থেকে যৌথবাহিনীর ক্যাম্প সরিয়ে পড়াশোনা চালুর দাবি জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দিনের পর দিন মিছিল করেছে। সেই প্রতিবাদী মিছিলে যৌথবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের চিত্র সমস্ত সংবাদমাধ্যমেই উঠে এসেছিল।

আসলে কায়েমি স্বার্থের রক্ষক, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিভূরা ছাত্র আন্দোলন তথা গণআন্দোলনের কণ্ঠকেই স্তব্ধ করতে চায়। তারা চায় না বর্তমান অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী সমাজ যে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, রুচিবিকৃতির জন্ম দিচ্ছে তার হাত থেকে ছাত্র সমাজ মুক্ত হোক, সমাজ জুড়ে যে অসংখ্য অন্যায় ঘটে চলেছে ছাত্র-যুবরা তার প্রতিবাদে এগিয়ে আসুক। যথার্থ নীতিভিত্তিক রাজনীতিই ছাত্রদের এ সবের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন ছাত্রদের চরিত্র দেয়, চরিত্রের মানকে উন্নত করে। একদিন যারা ইংরেজি শিক্ষার দাবিতে মিছিল করেছিল সেই ছোটরা আজ বড় হয়েছে। তারা গর্বের সাথে সে অতীতকে স্মরণ করে।

আসলে মানুষের চেতনাকে এই কায়েমি স্বার্থবাদীরা ভয় পায়, মানুষের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় এদের মেরুদণ্ডে হিমশীতল স্রোত বয়ে যায়। শোষিত মানুষের শিক্ষার দাবি, বাঁচার দাবিকে এরা বলে রাজনীতি, আর শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন এদের দৃষ্টিতে সুশাসন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ এদের একতরফা ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারে বিশ্বাস করবেন না। এদের এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝে আগের মতোই আন্দোলনের সপক্ষে অবিচল থাকবেন, না হলে সাধারণ মানুষের বাঁচার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শাসকের শোষণ-ফাঁস নিপীড়িত মানুষের গলায় আরও দৃঢ় হয়ে বসবে।

ছাত্ররাই অগ্রণী সৈনিক

একের পাতার পর

শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে পথের দাবি উপন্যাসে বলেছেন, শান্তির মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি হল তারাই যারা অপরের পথ জুড়ে অট্টালিকা বানিয়ে বসে থাকে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা জনগণের অসুবিধার দোহাই দেন, তারা বারো মাস তিরিশ দিন বেকারি মূল্যবৃদ্ধি পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধিতে জর্জরিত মানুষের জন্য কতটুকু চোখের জল ফেলেন? অশ্লীলতাকে যারা 'সাহসিকতা' বলে দেশজুড়ে নির্লজ্জ বেহায়াপনার স্রোত বওয়ানোর কুকর্মে লিপ্ত, তারা যখন মানুষের অসুবিধার দোহাই দেয়, তখন তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় কি? প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো তুলে দিয়েছিল সি পি এম ফ্রন্ট সরকার, তার মাশুল কাদের দিতে হচ্ছে? দিতে হচ্ছে তাদেরই যাদের বয়স ছয় থেকে শুরু। আজ যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া হয় তবে তার মাশুলও দিতে হবে স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের, কাজেই প্রতিবাদ তো তারা করবেই। যাঁরা মিছিলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের যোগদান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তাঁদের উদ্বেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায়, এটাকেই যারা বড় করে দেখিয়ে সত্যমিথ্যায় প্রচার চালাচ্ছে, তারা কিন্তু মতলববাজ, তাদের হীন উদ্দেশ্যই হচ্ছে ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

সমাজে যতদিন অন্যায় থাকবে, অনাচার থাকবে দুর্নীতি থাকবে বৈষম্য থাকবে শোষণ থাকবে ততদিন তার বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলনও থাকবে। তাতে যোগ দেবে সর্বস্তরের মানুষ, একদল শোষণের স্বার্থে আইনের দোহাই দেবে, শান্তির দোহাই দেবে, বয়সের দোহাই দেবে। কিন্তু যুগে যুগে ন্যায়ের ডঙ্কা বাজাবে স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষুদিরামের দল। এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ওড়িশা জুড়ে সফল ছাত্র ধর্মঘট

ওড়িশার কলেজ এবং স্কুলগুলিতে ব্যাপক সংখ্যক শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া এবং প্রতিটি কলেজে বিপুল হারে উন্নয়ন ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ৯ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও-র ডাকে সারা ওড়িশা ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ওড়িশা সরকার গত ২১ বছরে কোনও পূর্ণ সময়ের স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করেনি। শিক্ষার অধিকার আইন চালু করার মধ্য দিয়ে সপ্তম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দিচ্ছে। এর ফলে ওড়িশার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছিল। এই অবস্থায় এ আই ডি এস ও ওড়িশার সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষকরাও এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিতে থাকেন। ১৭ আগস্ট বিধানসভা শুরুর প্রথম দিন, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনরা বিধানসভার সামনে অনশনে বসেন। এর সমর্থনে এ আই ডি এস ও ঐ দিন ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত করে। ছাত্র এবং শিক্ষকদের এক বিরাট মিছিল উচ্চ এবং জনশিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়। তাদের এক প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সাথে দেখা করে অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানায়। ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্র ধর্মঘটের দিন ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে মিছিলে সামিল হয় এবং রাস্তা অবরোধ করে, প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। কটকের র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রখ্যাত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা রাজ্য জুড়ে স্কুল-কলেজগুলিতে এই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

২৬ সেপ্টেম্বর
ভারতীয় নবজাগরণে অন্যতম পথিকৃৎ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে
পাশফেল তুলে দেওয়ার নীতির প্রতিবাদে
সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে

পদযাত্রা

ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়ার
জমায়েত ঃ মেট্রো চ্যানেল, বেলা ১টা

বিদ্যাসাগর স্মরণ

মহাজাতি সদন
২৬ সেপ্টেম্বর, বিকাল ৪টা
আলোচক ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

আয়োজক
এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও,
এ আই ডি ওয়াই ও, পথিকৃৎ, কমসোমল

আসাম সমস্যা সমাধানে আলফার প্রস্তাব বিপজ্জনক

গুয়াহাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, শোষিত মানুষের মুক্তিপথের দিশারি কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আসামের জেলায় জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ দিবস পালিত হওয়ার পর ৯ আগস্ট রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যভিত্তিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি।

প্রধান বক্তা দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, আমরা প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্মরণ করি, কিন্তু এই দিনটিতে সমস্ত নেতা ও কর্মীরা একত্রিত হয়ে ভারতবর্ষের বিপ্লব তথা বিশ্ব বিপ্লবের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার পথে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি তদানীন্তন সমাজের প্রয়োজন সর্বোন্নত রূপে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন তাঁরাই মহৎপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আমাদের দেশেও সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করার পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপলব্ধি করতে হলে সেই সময়ের দেশ ও বিশ্বের ঘটনাবলী জানা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ার সংকল্প নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলন গড়ে তুলতে বিভিন্ন মতবাদিক শক্তির সমন্বয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। সেদিন এই মঞ্চ একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়নি। আর আমাদের দেশে এই আন্দোলন যখন চলছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। মুষ্টিমেয় মানুষ কর্তৃক কোটি কোটি মানুষের শোষণের অবসান ঘটাতে মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব সংঘটিত করছিল। মহান লেনিন কেবল রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা। তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে লেনিন সেদিন তত্ত্বগত দিকনির্দেশ তুলে ধরে বলেছিলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে যেভাবে রাজতন্ত্রের, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল, সে যুগের আজ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পুঁজিবাদ আজ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। তাই আজ যদি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয় তাহলে জনসাধারণ আর এক নির্মম শোষণের বলি হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় সে সব দেশের প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে বুর্জোয়াশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই পথেই দেশের জনগণের উপর নতুন শোষণমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে হবে এবং শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম করতে হবে।

আমাদের দেশে ১৯২০ সালে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নাম নিয়ে একটি পার্টি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দলটি লেনিনের পথনির্দেশ অনুসরণ করা তো দূরের কথা তার বিপরীত কাজটিই করেছে। প্রথমত, যখন কংগ্রেস একটা মঞ্চ হিসাবে কাজ করছিল, তখন তারা তার থেকে দূরে থাকল। আবার মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর যখন কংগ্রেস জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর একটা দলে রূপান্তরিত হল তখন সি পি আই দলটি গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার লেজুড়বৃত্তি করতে থাকল। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আপসমুখী স্বাধীনতা আন্দোলন যখন গতিহীন হয়ে পড়েছিল তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা আপসহীন সংগ্রামী ধারা গড়ে উঠেছিল। এই আপসহীন সংগ্রামী ধারাকে সেই সময় লেনিনের সহকর্মী হিসাবে কাজ করা এম এন রায়ও স্বাগত জানিয়ে তাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিলেন। নেতাজির নেতৃত্বে

পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রভাবে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহী মানসিকতার জন্ম হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। এমনকী ব্রিটিশের ভাড়াটে সেনাবাহিনীতেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে, বোম্বেতে নৌবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু এই আপসহীন সংগ্রামী ধারাকে সমর্থন করে তার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া দূরের কথা, কমিউনিস্ট নামধারী অবিভক্ত সি পি আই দলটি ভারত ছাড়ো আন্দোলন সহ এই আপসহীন সংগ্রামী ধারাটির বিরোধিতা করতে থাকে। এমনকী তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী হিসাবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই যে, এই আপসহীন সংগ্রামী ধারার প্রভাবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝল যে, ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে এই দেশ শাসন করা আর সম্ভব নয়। যারা একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, স্বাধীনতা চাইলে এমনই হাজার একটা জালিয়ানওয়ালাবাগ হবে, তারাই ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। চীন দেশে মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন যেভাবে লেনিনের শিক্ষা মেনে এগোচ্ছিল, সি পি আই দলটির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই দেশে মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তিতে আন্দোলন সেভাবে গড়ে উঠল না। তারই ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আপস করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হল। দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষ, ছাত্র-যুবক যারা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করল, জীবন আহুতি দিল, যাদের বোঝানো হয়েছিল যে, ব্রিটিশ চলে গেলে দেশের সম্পদ দেশের ভিতরে থাকবে, তাদের জীবনে সুখ শান্তি আসবে, যারা সত্যিই এক শোষণহীন সমাজ কামনা করেছিল, তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা মার খেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মর্মান্তিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবে যাঁরা কমিউনিজমের ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছিলেন, কমিউনিস্ট নামধারী এই দলটির এহেন ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ তাঁদের মধ্যে কমিউনিজমের আদর্শ সম্পর্কেই মারাত্মক ধরনের সংশয় ও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল।

সেই সময়কার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, ব্রিটিশদের শাসন-শোষণের অবসান ঘটতে যাচ্ছে অথচ তার জায়গায় দেশেরই পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন ও শোষণ প্রবর্তিত হচ্ছে দেখে দেশের জনসাধারণ ও সচেতন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একাংশের মধ্যে গভীর ব্যথা-বেদনার জন্ম হচ্ছিল। কেন এই অঘটন? ত্যাগ ও শৌর্য-বীর্যে ভরপুর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন এই করুণ পরিণতি — এই প্রশ্নই তাঁদের বিচলিত করে তুলছিল, তাঁরা উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষই তার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন। তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিটির শুরুর দিন থেকে তার কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, এই দলটি নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও একটা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। আর তাদের এই ব্যর্থতার ফলস্বরূপই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল সুফল টাটা বিড়লা প্রমুখ পুঁজিপতিরা কেড়ে নিল, তারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হল। দেশের মানুষ নতুন করে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন-শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ হল। সেদিনের পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন যে, দুনিয়ার প্রথম সর্বহারা বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে পথনির্দেশ রেখে গেছেন, সেই মৌলিক দিকনির্দেশকে সামনে রেখে একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা প্রয়োগ করার পথে একটা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের জন্ম দেওয়াটাই হচ্ছে বিপ্লবী দল গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। তার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে সঠিক বিপ্লবী দলের জন্ম দেওয়া। তিনি বললেন, কমিউনিস্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা আর যথার্থ কমিউনিস্ট হওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বললেন, ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক ব্যাপ্ত করে একটি সর্বব্যাপক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম দেওয়া, শোষিত নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেওয়া, শ্রেণীচিন্তা জাগ্রত করা, আর এই পথেই নিজেকে ডিক্লাসড করে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে একীভূত হওয়ার পথেই কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করা সম্ভব এবং এই সংগ্রামে যাঁরা সফলতা লাভ করবেন একমাত্র তাঁরাই একটা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথ উন্মুক্ত করবেন। কিন্তু সি পি আই দলটি সে পথেই গেল না। বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসা কিছু লোক কোনও পদ্ধতি না মেনেই রাতারাতি একটা পার্টি গড়ে তুলে একে একটা কমিউনিস্ট পার্টি বলে আখ্যা দিয়ে দিল। ফলে এটা একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হওয়ার পরিবর্তে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাবনা-চিন্তা, যেটা বস্তুত বুর্জোয়াশ্রেণীরই চিন্তা — তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী একটা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত হল। এরই ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীচিন্তা কাজ করছিল — দেশের অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণ চাইছিল সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত এক সমাজ, আর অপরদিকে দেশের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিবর্তে দেশের বাজারের উপর তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, দেশের আপামর জনসাধারণকে তাদের শোষণের জালে আবদ্ধ করা। সি পি আই এটা ধরতে পারল না। তাই তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকেই সহায়তা করল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিশ্লেষণ তুলে ধরে বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর এদেশের মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রাম নতুন এক অভিমুখে ধাবিত হল। ভারতবর্ষের বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে উচ্ছেদ করাই ভারতের বিপ্লবের লক্ষ্য হয়ে উঠল। দৃঢ়তার সাথে তিনি বললেন, এই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভারতবর্ষের মাটিতে একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে। সি পি আই দলটিকে কমিউনিস্ট পার্টি ভেবে যাদের মনে কমিউনিজম সম্পর্কেই নানা সংশয় ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষের এই ব্যাখ্যাই তা দূর করতে সহায়তা করল। এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষ সেদিন এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ কেবল বিপ্লবী দল গঠনের সঠিক মার্কসীয় বিশ্লেষণই তুলে ধরেছিলেন তা নয়, একইসঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট দল গড়ে তোলার সংগ্রামে নিমগ্ন হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ একাকী, কপর্দকহীন, কোনও পৃষ্ঠপোষকতাই নেই তাঁর পিছনে। একটাই অবলম্বন — নিজের জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের আগুনে পোড় খাওয়া চরিত্র। নিজের পিতা মাতা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, আর কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁদের বড় ছেলে। তাঁরা ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতায় এলেন। দেশে তখন স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্ত। যাঁরা সেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁরা জীবন-জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়েছেন। শিবদাস ঘোষের পিতাও চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র পরিবার দেখুক। কিন্তু শিবদাস ঘোষ পিতাকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে মানুষ হতে দাও। দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কর্তব্য বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে একজন দু'জন করে বুঝিয়ে যাঁদের সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর সঠিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁদের কোনও সংশয় না থাকলেও, এই হাতে গোনা কয়েকজনকে নিয়ে কঠোর সংগ্রাম আরম্ভ করা যায় কিনা, এই প্রশ্নটিও তাঁদের মনে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ এক ঐতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, জেনেশুনে আমরা কি গোলামি করতে পারি? তাই কী হবে জানি না, কিন্তু যা সত্য বলে জেনেছি সে পথে আমাকে হাঁটতেই হবে। এই একটি কথাই বিপ্লবী দল গড়ে তোলার প্রথম সেনানীদের সকল সংশয় ও দ্বিধা নির্মূল করে তাদের মহা শক্তিমান করে তুলেছিল। মানুষকে বিপ্লবের কথা বুঝিয়ে এক পয়সা, দু'পয়সা করে যেটুকু অর্থ সংগ্রহ হয়েছে তাতে কোনও দিন খাবার জুটেছে, কোনও দিন জোটেনি। তিনি বলেছিলেন, এই পথে মৃত্যু আসতে পারে, কিন্তু করার কিছু নেই। এই ছিল মানসিক দৃঢ়তা। এই ছিল তাঁর সমস্ত প্রতিবন্ধকতা হটানোর তেজ। তাঁর নেতৃত্বে গুটিকয়েক সৈনিকের অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম, তারই গতিধারায় এই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলটি ভারতবর্ষের মাটিতে গড়ে উঠেছে, প্রতিদিন শক্তি বৃদ্ধি করছে আর পুঁজিপতিশ্রেণীর ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। অপরদিকে, কমিউনিস্ট নামধারী ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ব্র্যান্ড — সি পি আই, সি পি এম এমনকী নকশালবাদীরা আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতেও দ্বিধা করছে না। দল গঠনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে path breaking সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তার ফলেই দল আজ এই জায়গায় এসেছে। বিগত ৩৫ বছর এই মহান নেতার অনুপস্থিতিতে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তাঁর চিন্তাকে অবলম্বন করেই আমরা কাজ করে চলেছি এবং এই পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ শুরুর দিনই বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতে, সর্বতোভাবে বড় হতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে আর জনগণের জীবনে নিয়ে আসবে অভাবনীয় দুর্গতি। বিগত ৬৪ বছরের শাসন এই কথাই প্রমাণ করছে। আজ দেশের পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, বিশ্বের সমস্ত পুঁজিপতিদের মধ্যে ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানে এসে পৌঁছেছে। অপরদিকে দেশের জনসাধারণের ৭০ ভাগ মানুষ প্রতিদিন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা মৃত্যু কামনা করছে,

সাতের পাতায় দেখুন

‘আশা’ কর্মীদের বিশাল সমাবেশ

গ্রামীণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে প্রসূতি মা ও শিশুদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ‘আশা’ কর্মীদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে তাঁদের বেতন মাত্র ৮০০ টাকা। এই সামান্য কটা টাকায় কী করে তাঁরা নিজেদের এবং সন্তানদের স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও উদ্বেগ নেই। এই কর্মীদের না আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, না আছে পেনশন, বোনাস ইত্যাদির ব্যবস্থা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এক কালা সার্কুলারে আশা কর্মীদের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। এদের কোনও ছুটি নেই, রাতেও কাজ করতে হয়। কিন্তু বেতন বাড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেই। কী নিষ্ঠুর, অমানবিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার!

এই বঞ্চনার শিকল ভাঙতেই তাঁরা গড়ে তুলেছেন ‘পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন’। ইউনিয়নের ডাকে আট সহস্রাধিক কর্মী ৯ সেপ্টেম্বর ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে এক বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দু’টি বড় মিছিল মেট্রো চ্যানেলে আসে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচার করে মানুষের অসুবিধা করে মিছিল নয়। কিন্তু তাদের ঠুলিপরা চোখে এই মানুষদের চূড়ান্ত বঞ্চনা বা অসুবিধা চোখে পড়ে না। তাই তাদের কাছে এই মিছিল আখ্যায়িত হয় যানজট সৃষ্টিকারী হিসাবে।

বেলা ১২টায় ইউনিয়নের সভাপতি বিমল জানার সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। প্রধান বক্তা এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, আন্দোলন ছাড়া আপনাদের দাবি আদায় হবে না। তিনি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা কেন জরুরি প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করেন। ইউনিয়নের সম্পাদিকা কৃষ্ণা প্রধান বলেন, কোনও অবস্থাতেই বেতন হ্রাস চলবে না, কালা সার্কুলার বাতিল করতে হবে, আশা কর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পাপিয়া অধিকারী, হামিদা গাজী, বানাতুন্নাস, নয়নতারা হাজরা প্রমুখ।

অণ্ডালে ১৯টি মৌজায় জমি রক্ষার লাগাতার আন্দোলন

যেদিন পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ১৮৮৫ সালের কালা কানুন প্রয়োগ করে ‘বেঙ্গল এরেট্রপলিস নামে একটি কোম্পানির স্বার্থে বর্ধমান জেলার অণ্ডালগ্রাম, দুবচুড়িয়া, তামলা, আরতি, পশ্চিমখণ্ড সহ ১১টা মৌজার হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকার একমাত্র অবলম্বন জমি অধিগ্রহণ করতে নামে, সেদিনই এলাকার মানুষ জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিরোধের প্রয়োজনে ‘কৃষক-খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি’ নামে একটি শক্তিশালী মঞ্চ গড়ে তুলে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ২০০৮ সাল থেকে আবেদন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। কৃষক-খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি এলাকার অপর একটি সংগঠন ‘কৃষক-স্বার্থ রক্ষা’ কমিটি’কে সাথী করে জোরালো আওয়াজ তোলে — (১) জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা চলবে না, (২) জমির মালিকদের সাথে আলোচনা করেই জমির দাম নির্ধারণ করতে হবে, (৩) ইচ্ছুক জমিদাতাদের বাজারদরে জমির দাম দিতে হবে, (৪) ভাগচাষি/বর্গাদারদের সরকারি শংসাপত্র দান এবং জমির দামের ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে, (৫) কৃষিমজুরদের সরকারের মজুরিহারে পাঁচ বছরের মজুরি এককালীন দিতে হবে। (৬) কৃষি পেনশন চালু করতে হবে। এই দাবিগুলি নিয়ে ব্লক-স্তরে, মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের দপ্তরে বারবার আলোচনা করে সুষ্ঠু মীমাংসা চাওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে পূর্বতন সরকার ভাগচাষি/বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত দিতে চেয়েছেন, এ ছাড়া অন্য কোনও দাবির মীমাংসা না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ ও বিভিন্ন স্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এসেছে, এমনকী পূর্বতন সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে বিষয়গুলি জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এলাকার মানুষের দাবিগুলি বিবেচিত হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর গত ১৯ আগস্ট ‘বেঙ্গল এরেট্রপলিস’ পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে মেসিন-যন্ত্রপাতি সহ অনিচ্ছুক চাষিদের জমি দখলে নামলে এলাকার মানুষের প্রবল প্রতিরোধে পুলিশ পিছু হটে। ২৪ আগস্ট পুনরায় পুলিশ সহ কর্তৃপক্ষ এলে মানুষ অতি দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এবার পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। এর প্রতিবাদে শ’য়ে শ’য়ে বিক্ষুব্ধ মানুষ ২ সেপ্টেম্বর মিছিল করে ব্লক আধিকারিকের কাছে প্রতিবাদ জানায়। এলাকার মানুষ জেনে গিয়েছে এই প্রকল্পে এলাকার সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ নেই। বিমানবন্দর ছাড়া এখানে হবে লজিস্টিক হাব, ফিশ পার্ক, সুইমিং পুল, গলফ ক্লাব, শপিং মল, অর্থাৎ ধনী ঘরের সন্তান-সন্ততিদের বিহার ক্ষেত্র। তাই এলাকার মানুষ তাদের দাবি আদায়ে দৃঢ় সংকল্প। অনিচ্ছুক চাষিরা বাঁশের বেড়া দিয়ে তাদের জমি ঘিরে রেখেছে। মরণ পণ করে তাদের জমি রক্ষা এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার আন্দোলনে তারা বদ্ধপরিকর।

বিশ্বায়ন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে

সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

উত্তরোত্তর শিশু শ্রমিকবৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ২৯ আগস্ট সংসদে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। তিনি বলেন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে তীব্র বেকারত্ব বৃদ্ধির অসহনীয় পরিস্থিতিতে পরিবারের শিশুরাও মজুরি খাটতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন নিরপেক্ষ সংস্থা বা এন জি ও-র হিসাবে ভারতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬ থেকে ১২ কোটি। গত দুই দশকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি অনুসরণের ফলে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং ধনী ও গরিবের বৈষম্য বিস্তৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্যের তীর শাসক কংগ্রেসের দিকে যাওয়ায় তাদের সাংসদরা প্রবল হট্টগোল শুরু করে দেন। স্পিকারের হস্তক্ষেপে গোলমাল থামলে ডাঃ মণ্ডল বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, এটা আমাদের লজ্জা যে, আমাদের মাতৃভূমি বিশ্বে শিশুশ্রমের রাজধানী। তিনি জানতে চান, শিশুশ্রমিক রোধে সরকার সুনির্দিষ্ট কী ব্যবস্থা নিয়েছে? প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়ে বলেন, শিশুশ্রম দপ্তরে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, ইন্সপেকশনের (পরিদর্শন) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে শিশুশ্রম কমবে কি? বিতর্কের সমাপ্তিতে স্পিকার বলেন, ‘শিশুরা আমাদের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। কিছু শিশু আছে কেবল পড়ে, আর কিছু শিশু আছে যারা পড়ে এবং মজুরি খাটে।’ কিন্তু এ ছাড়াও রয়েছে আর এক শ্রেণীর শিশু, যারা শুধু মজুরিই খাটে। স্পিকার এর অবসান চাইলেও পুঁজিবাদী পথে যে তা সম্ভব নয় সংসদে তা আলোচিত হয়নি।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা রাজপথে

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে শিক্ষা ও শিক্ষকের বাঁচার দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি রানি রাসমণি রোডে সারাদিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

তাঁদের দাবি, প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম একজন অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ, অবসরের দিনেই শিক্ষকদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদান এবং বকেয়া প্রায় ৬০ হাজার পেনশন কেসের দ্রুত নিষ্পত্তি, শিক্ষকদের সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য ‘টিচার্স হেলথ হোম’ স্থাপন, ৪০ হাজার শূন্যপদে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ এবং এক্ষেত্রে পি টি টি আই শিক্ষার্থী এবং পার্শ্বশিক্ষকদের অগ্রাধিকার প্রদান, বাসস্থানের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে শিক্ষক বদলি এবং এক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষিকাদের অগ্রাধিকার দান, শিক্ষাদান ব্যতিরেকে অন্য কোনও কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ না করা ইত্যাদি। এ ছাড়াও তাঁরা দাবি জানান, শিক্ষানীতি নির্ধারণ, সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ করতে হবে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া চলবে না।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বলেন, স্বাধীনতার ৬৪ বছর এবং বিগত সরকারের ৩৪ বছরের শাসনে শিক্ষার মান অধোগামী। শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিলুপ্ত করে দলবাজিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আমলে এর ব্যতিক্রম তিনি আশা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি তপন রায়চৌধুরী, আনন্দ হান্ডা, তপতী মিত্র, মোসাব্বর হোসেন, সতীশ সাউ, আবুল হোসেন, কনক সর্দার প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে রাজ্যপালের দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে ‘শিক্ষা বাঁচাও দিবস’ হিসাবে পালন করার জন্য কলকাতায় বিশাল পদযাত্রায় সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

রূপনারায়ণ নদীবাঁধ সংস্কারের দাবি

কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ বিপজ্জনকভাবে বসে যচ্ছে। এ বছর বর্ষার শুরুতেই নূতন বাজারের কাছে মেরামত করা বাঁধ আবার বসে যায়। দেনানের কাছে প্রায় ২০০ ফুট বাঁধও নতুন করে বসে যায়। প্রত্যেক বারই সেচদপ্তর থেকে জোড়াতালি দিয়ে বাঁধ মেরামত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। স্থায়ীভাবে মেরামত হচ্ছে না। রূপনারায়ণ নদীর প্রবল স্রোত কোলাঘাট শহর সংলগ্ন নদী বাঁধ-এর নীচ দিয়ে বইছে। তাই বার বার বিভিন্ন জায়গা বসে যাচ্ছে। কোলাঘাটে এই নদীর উপর দুটি রেল ব্রিজ এবং একটি কংক্রিট ব্রিজ আছে। বর্তমানে আরও দুটি কংক্রিট ব্রিজ পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে। এছাড়া এই নদীর মাঝখানে বিদ্যুতের টাওয়ার বসানো হয়েছে। এসবই হয়েছে ঘন ঘন থাম দিয়ে। একটি নদীর উপর এভাবে কাছাকাছি ৫টি ব্রিজ এবং টাওয়ার বসানো সমীচীন কিনা তা রীতিমতো ভাবার বিষয়। এর ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে কোলাঘাট শহরের বিপরীত দিকে বিশাল চড়া পড়েছে। গভীর স্রোতকে নদীর মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা না করলে নদীর এই ভাঙন বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু টাকা নেই এই অজুহাতে পূর্বতন সরকার এই সমস্যা সমাধানের দাবি বারবার উপেক্ষা করে গেছে। এই অবস্থায় কোলাঘাটের ব্যবসায়ী, দোকানদার সহ সর্বস্তরের মানুষ কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদী বাঁধ রক্ষা কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে ২১ আগস্ট সেচ দপ্তরের এসডিও-র সাথে কোলাঘাটে আলোচনা করা হয়েছে। ২৪ আগস্ট মহাকরণে সেচমন্ত্রী মানস ভূঞ্যার নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশনে কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শঙ্কর মালাকার, কমল জৈন এবং সহসভাপতি বৈদ্যনাথ ঘোষ অংশগ্রহণ করেন। সেচমন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেচদপ্তরের মুখ্য বাস্তুকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

বর্ধিত বেতনের টাকায় ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

সংসদে দাঁড়িয়ে সাংসদদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। সেদিন তাঁর কথা ধোপে টেকেনি। বরং ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাঁকে তুলোধনা করেছিলেন লালুপ্রসাদ যাদবের মতো সাংসদরা। সেদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বর্ধিত বেতন তাঁর কেন্দ্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করবেন।

জয়নগরের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল সেই ভাবনা বাস্তবায়িত করলেন ৪ সেপ্টেম্বর। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়ার জন্য বৃত্তি পরীক্ষা হল এ দিন। কোনও রাজনীতি বা স্বজনপোষণ নয়, সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৬ জনকে বাছাই করা হল। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় বসেন ৬৬১ জন। এরা সবাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত। মাসখানেক আগেই বিভিন্ন স্কুল থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধাভিত্তিক নামের তালিকা সাংসদের কাছে পাঠিয়েছিলেন স্কুলের প্রধানরা। ৪ সেপ্টেম্বর এক প্রতিনিধিদল নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল। নবম ও দশম শ্রেণীর সফল ছাত্রছাত্রীরা মাসিক বৃত্তি পাবেন ৭০০ টাকা করে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ১ হাজার টাকা করে পাবেন। এই বৃত্তির নামকরণও করা হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৃত্তি পাবেন নবম ও দশম এবং রবীন্দ্র বৃত্তি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেওয়া হবে। সাংসদ হিসাবে এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করলেন জয়নগরের সাংসদ।

ডাঃ মণ্ডল বলেন, ''আমরা জনপ্রতিনিধি। জনগণের কাজ করা আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের বেতন এত হবে কেন? আমিই একমাত্র সংসদে দাঁড়িয়ে সেদিন প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তা যখন হল না, আমার বেতনের বর্ধিত টাকা আমার কেন্দ্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে ছাত্রছাত্রী ও এলাকার মানুষজন উপকৃত হবেন। বহু ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছেন। সঠিক নির্বাচনের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমি যতদিন সাংসদ থাকব, প্রতি বছর দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেব''।

ডাঃ মণ্ডলের এ হেন উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন। খুশি ছাত্রছাত্রীরাও। গ্রামবাসীদের কথায়, 'কোনও সাংসদকে এই ধরনের উদ্যোগ নিতে শোনা যায়নি। সে ক্ষেত্রে জয়নগরের সাংসদ সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা গর্বিত'। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ৬/৯/'১১)

পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

আলফার প্রস্তাব বিপজ্জনক

পাঁচের পাতার পর

অনেকে আত্মহত্যা করছে। গরিব পিতা স্ত্রী সন্তানকে হত্যা করে আত্মঘাতী হচ্ছে। কেবল পিতাই নয়, সন্তান ধারণ করা মাতাও নিজ সন্তানদের খেতে দিতে না পেরে একই পথে সন্তানদের হত্যা করে গলায় ফাঁস লাগাচ্ছে। পেটের জ্বালা মেটাতে গরিব মেয়েরা দেহ বিক্রির পথে পা দিতে বাধ্য হচ্ছে। ছাত্র-যুবকরা সমাজবিরোধী হয়ে উঠছে। তাদের পেশাদার খুনিতে পরিণত করা হচ্ছে। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সমাজজীবন থেকে উবে যেতে বসেছে।

কার্ল মার্কস বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত মানবিক সম্পর্ক টাকার সম্পর্কে অধঃপতিত হবে। তার লক্ষণ আমাদের দেশের সমাজজীবনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সারা দেশে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র। তারা দুর্নীতির চূড়ান্ত শিকার। দরিদ্র মানুষের দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, কারণ দুর্নীতি করার ক্ষমতা তাদের নেই। দুর্নীতি প্রধানত সীমাবদ্ধ দেশের ১০ শতাংশ ধনীদের মধ্যে। পত্রপত্রিকায় তো সমস্তটা প্রকাশ পাচ্ছে না, পুঁজিপতিদের পত্রিকা তাদের কথা তুলে ধরেই বা কেমন করে। তথাপি যে দু-একটা ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে মানুষ স্তম্ভিত হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পুঁজিপতিরা ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, মানুষ মাত্রেই লোভী। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষের মধ্যে কোনও লোভ ছিল না। যেদিন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই শোষকশ্রেণীর মধ্যে এই মানসিকতা জন্মলাভ করেছে।

পুঁজিবাদ যে মানুষকে কোথায় নামাবে, তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের জীবনের মৌলিক জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কোনও প্রতিকার হবে না। তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। নির্বাচনের মাধ্যমে পুঁজিপতিশ্রেণীর এ দল বা সে দল ক্ষমতায় আসবে এবং তারা পুঁজিপতিশ্রেণীকেই শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। সমস্ত সম্পদ এই প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হবে, আর সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়ায় সর্বহারাতে পরিণত হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই কেবল এই মেরুকরণ হচ্ছে না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হচ্ছে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বাইরে বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল পুঁজিপতিদের পক্ষে। তাই তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, শোষিত জনগণকে এই নির্বাচনী মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উৎখাত করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, এ যুগে পুঁজিপতিশ্রেণী বিপ্লবের ভয়ে ভীত। তাই ভারতের পুঁজিপতিরা স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের ধারায় সমস্ত রকমের সামন্তী ভাবনা থেকে মুক্ত করে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনও প্রচেষ্টাই নেয়নি। জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্ত রকম বিভেদকামী মানসিকতাকে জিইয়ে রেখেছে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ আন্দোলন যাতে বিপ্লবী আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আজ তারা বিভেদকামী মানসিকতাকে আরও উসকে দিচ্ছে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার বিপ্লবের সমস্ত দিক সম্পর্কে মূল্যবান শিক্ষা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। সেই শিক্ষার কয়েকটি দিক মাত্র আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কমরেড শিবদাস ঘোষের সমস্ত শিক্ষা অনুধাবন করার পথে দেশের বুকে বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে আসতে আসাম রাজ্য তথা দেশের সমস্ত শোষিত মানুষের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

আসামের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ পরেশ বরুয়াকে বাদ দিয়ে আলফা আন্দোলনের যে নেতারা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত আসামের জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন আসামের জনগণ তাঁদের স্বাধীন আসামের দাবির পক্ষে নন, তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে নন। এই আন্দোলনের শুরুতেই আমরা তাঁদের এই সশস্ত্র সংগ্রামের অকার্যকারিতার দিকগুলি দেখিয়ে তাঁদের এই সর্বনাশা পথ পরিত্যাগ করার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছিলাম। ১৯৯৬-৯৭ সালে আলফা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন সর্বদলীয় সভায় আমরা বলেছিলাম, যদি জনগণকে এই আন্দোলনের চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক দিক বুঝিয়ে তার বিরুদ্ধে সচেতন করা না যায়, তাহলে হাজার হাজার ছাত্র যুবকের বৃথা প্রাণনাশ হবে। কিন্তু বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা সামরিক বাহিনী নামিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও দাঁড়ালেন না, আবার রাজ্যের জনগণকে এই হঠকারী সশস্ত্র সংগ্রামের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক প্রস্তাব সম্পর্কেও সচেতন করলেন না। এরই অনিবার্য পরিণামে কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ হাজার দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকের প্রাণনাশ হল। আপন অভিজ্ঞতায় রাজ্যের জনগণ এই আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকটি বুঝতে পেরেছেন এবং তাদের চাপেই আলফা নেতারা আজ আলোচনার পথে এসেছেন। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আমাকে যদি বলা হয় এই আলোচনায় কী দাবি করা উচিত, আমি বলব আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি মূল বিষয়। রাজ্যের শিল্পায়ন, রেলের বৈদ্যুতিকরণ, কৃষির আধুনিকীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দাবিগুলো যাতে আলফার নেতারা উত্থাপন করেন তার জন্য রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। তিনি বলেন, আমরা লক্ষ করছি, এই অতি প্রয়োজনীয় দাবিগুলো নয়, ভয়ানক ক্ষতিকারক কিছু দাবি তারা উত্থাপন করছেন। তারা অসমীয়াভাষী জনগণের তথাকথিত অস্তিত্ব রক্ষার নামে আসাম বিধানসভার অধিকাংশ আসন অন্যান্য উপজাতিপ্রধান রাজ্যগুলোর মতো অসমীয়াভাষী মানুষের জন্য সংরক্ষণ করার দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা দ্বি-নাগরিকত্বের দাবিও উত্থাপন করেছেন। একদিকে আসু ও অন্যান্য উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা 'ডি' ভোটারের নামে, নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটাধিকার, নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, অপরদিকে আলফা নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে চাইছেন। ব্রিটিশ প্রবর্তিত জঘন্য 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড'-এর ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের দুটি নির্বাচকমণ্ডলীতে বিভক্ত করা হয়েছিল, যা সাম্প্রদায়িক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পথ উন্মুক্ত করেছিল, যারই চূড়ান্ত পরিণামে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল — তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আলফা নেতাদের এই মনোভাবের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেশের জনগণকে বিভক্ত করার ঐ জঘন্য মনোভাবের মূলগত কোনও পার্থক্য নেই। তাদের এই প্রস্তাব কার্যকর হলে, তা আসামের মাটিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে নিয়ে আসবে। আসামের জনগণের ঐক্য সংহতি চুরমার হয়ে যাবে। এমনকী আসামের ভৌগোলিক অস্তিত্বকেও নিশ্চিত রূপে বিপন্ন করবে।

কমরেড ভট্টাচার্য আরও বলেন, দেশ স্বাধীন করার সময়ে ব্রিটিশের চক্রান্তে মুসলমানদের 'অস্তিত্ব' রক্ষার নামে পাকিস্তান হল, কিন্তু সেখানে মুসলমান জনসাধারণের অস্তিত্ব কি রক্ষা পেয়েছে, না প্রতিদিন তা আরও বিপন্ন হচ্ছে? ভারতের লোকসভায় তো ভারতীয়রাই নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ থেকে জনগণ কি রক্ষা পাচ্ছেন? তাই আলফার দাবি মানা হলে মানুষে মানুষে কাটাকাটি, মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হবে, সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। এর ফলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি কাজটা আরও বহু বছর পিছিয়ে যাবে। কেবল তাই নয়, আলফা নেতারা অস্তিত্ব রক্ষার ধুয়া তুলে কয়লা ব্যবসা থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবসায় অ-অসমীয়াদের বিতাড়ন করে অসমীয়া মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করার দাবি তুলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা আসামে নতুন ধরনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন চাইছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে যেভাবে ক্ষমতায় বসে শোষণের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করল, ঠিক সেই ভাবেই আলফা নেতৃবৃন্দ তথাকথিত 'অস্তিত্ব' রক্ষার নামে অসমীয়াভাষী মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা পুঁজিপতি হতে চাইছেন। এই মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে শ্রেণীচিন্তার ভিত্তিতে অসমীয়াভাষী মানুষকে সচেতন করতে হবে। আর তা সম্ভব, যদি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে এই রাজ্যে মার্কসবাদী আন্দোলন শক্তিশালীরূপে গড়ে তোলা যায়। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই (সি) একটা শক্তি হিসাবে আসামে গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে সারা আসামে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রাম শক্তিশালী করতে হবে। এই পথেই আসামের বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ পরিবর্তন সম্ভব। এই পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রথম প্রস্তাবে রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কিছু সংখ্যক 'ডি' ভোটারকে বিনা বিচারে বাংলাদেশে বিতাড়ন করা, সমস্ত 'ডি' ভোটারকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে অবিলম্বে বিতর্কিত শোরণশিরি বৃহৎ নদীবাঁধ নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

সভার শুরুতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই দিনটি পালনের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

সভার সভাপতি রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে আসামের মাটিতে দ্রুত শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদকের মৃত্যুতে কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

(কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ সেপ্টেম্বর নিচের শোকবার্তাটি পাঠিয়েছেন।)

প্রিয় কমরেড,

আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বহারার স্বার্থরক্ষায় একনিষ্ঠ যোদ্ধা কমরেড চাচা মওলা বক্স খাসখেলির মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে বেদনার্ত ও শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তানের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একজন প্রথম সারির নেতাকে হারাল। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে প্রথাগত শিক্ষা না পেয়েও অত্যন্ত অল্প বয়সেই পুঁজিবাদী নিপীড়নের নাগপাশ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বৈরাচারী বুর্জোয়া শাসকদের রক্তচক্ষু ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে নিপীড়িত জনগণ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর এই পরিশ্রম ও সংগ্রামী জীবন পাকিস্তানের মাটিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষকদের অনুপ্রাণিত করবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলবে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্ভাল হয়ে উঠবে আধুনিক সংশোধনবাদের প্রভাবমুক্ত সঠিক পথে।

ভারতের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে আমরা পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং কমরেড খাসখেলির পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের এই গভীর দুঃখে আমরাও সমব্যথী। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, আপনারা এই গভীর শোকের মুহূর্তে বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করবেন এবং কমরেড খাসখেলি যে কাজের দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পণ করে গিয়েছেন তা রূপায়ণে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবেন।

প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
এস ইউ সি আই (সি)

দিল্লি হাইকোর্টে বিস্ফোরণের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

দিল্লি হাইকোর্ট-এর জনাকীর্ণ প্রবেশপথে বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছে। সাড়ে তিন মাস আগে প্রায় একই স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যেহেতু দিল্লির জনবহুল অঞ্চলগুলিতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের আগাম খবর ছিল এবং এই অঞ্চলগুলির সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের সহজ শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সরকার এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির উচিত ছিল এই স্থানগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সি সি টি ভি ক্যামেরা স্থাপন করা এবং নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পুলিশবাহিনীর জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয় না তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য।

এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী প্রকৃত অপরাধীদের ধরা এবং নিরাপত্তায় শিথিলতার জন্য দায়ী প্রত্যেককে শাস্তি দেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই (সি) বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করছে। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও যথার্থ পুনর্বাসনের দাবি আমরা জানাচ্ছি।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো ঃ সার্ভের দাবি জানালেন ব্যবসায়ীরা

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো সেন্ট্রাল স্টেশন মাটির নিচে তৈরি করার জন্য বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে ব্যাপক উচ্ছেদের আয়োজন করেছিল পূর্বতন সিপিএম সরকার। ২০০৭ সাল থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার মানুষ আন্দোলনে সামিল হন। এলাকায় ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, বাসস্থান ও অফিস উচ্ছেদ করে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে শপিং প্লাজা, মল ও হোটেল তৈরির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গড়ে ওঠে 'সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সিটিজেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'। লাগাতার আন্দোলনের চাপে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্পোরেশন লিখিতভাবে জানায় যে, প্রকল্পের কাজ চলাকালীন অস্থায়ী পুনর্বাসন এবং কাজ শেষে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের দাবি, আইনসম্মত চুক্তির মাধ্যমে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা সুনীল ঝাওর লিখিতভাবে জানান, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহনমন্ত্রী ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং দাবি করা হয়, স্টেশনের জন্য ঠিক কী পরিমাণ জায়গা দরকার, তা নতুন করে সার্ভে করা হোক। কিন্তু হঠাৎ ২৩ আগস্ট সংবাদে দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় স্থানীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধান করেছেন, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই আমরা মনে করি। ব্যবসায়ীদের সাথে কোনও আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ এবং সমস্ত সংবাদমাধ্যমে কমিটি লিখিত প্রতিবাদ জানায় এবং ৬ সেপ্টেম্বর বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট ও ফিয়ার্স লেনের সংযোগস্থলে প্রতিবাদী সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি কামাল আহমেদ খান, সাধারণ সম্পাদক জে পি সিং, যুগ্ম সম্পাদক সমর দত্ত সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী। সকলেই বলেন, দাবি মানা না হলে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনে নামা হবে। সকলে আশা প্রকাশ করেন, বর্তমান সরকার নিশ্চয় দাবি মানবেন।

আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক কাঞ্চন দাশগুপ্ত। তিনি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আবেদন করেন। তিনি বলেন, গণআন্দোলনই একমাত্র রাস্তা যা আপনাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের সাথী আয়সানুল হক। সভা শেষে এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। কয়েক হাজার মানুষ এতে সামিল হন।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সুশাসনে বিহারে এখন পুলিশরাজ

পাটনার নালা রোডের লঙ্গারটোলি গলিতে জল ও ময়লা জমে দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এলাকার নাগরিকদের সংগঠিত করে প্রতিবাদে সামিল হয় ডি এস ও এবং এম এস এস-এর কর্মীরা। অবিলম্বে জমা জল ও ময়লা অপসারণের দাবিতে গত ১২ আগস্ট শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলার সময় ডি এস পি রমাকান্ত প্রসাদ পুলিশবাহিনী সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সাথে কোনও আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করেন। মহিলা নেত্রী সাধনা মিশ্রের গায়ে হাত তুলতেও তার আটকায়নি। অপর মহিলাকর্মী সুমনলতা মৌর্য-র (পিঙ্কি) উপর ডি এস পি গাড়ির জ্বলন্ত টায়ার ছুঁড়ে মারেন। এরপরে এঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে লকআপে বন্দি করে পেটানো হয়, সঙ্গে চলে অশ্লীল গালিগালাজ। রাতে ৯ জন মহিলাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও, ৫ জন ছাত্রনেতা ও কর্মীকে আটকে রাখা হয়, যাদের মধ্যে ডি এস ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড জিতেন্দ্রও আছেন। এঁদের এমনকী জামিন দিতেও অস্বীকার করা হয়।

এর বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নীতীশকুমারের শাসনে পুলিশি অত্যাচারের এই একটি ঘটনাই শুধু নয়, নানা স্থানে এমন বহু ঘটনা তুলে ধরে বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নামেন, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি মিছিল ও ধর্নায় সামিল হয়, সর্বশেষ ৬ সেপ্টেম্বর মহিলা সংগঠনগুলি যৌথভাবে রাজভবন অভিযান করে *(উপরের ছবি)*।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, ১০ সেপ্টেম্বর বাকি পাঁচজন ডি এস ও নেতা এবং কর্মীদের কোর্ট জামিন দিয়েছে।

শিক্ষকতার চাকরি থেকে বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের বঞ্চিত করার কৌশল

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের সাম্প্রতিক একটি নির্দেশিকা একটা বিরাট অংশের শিক্ষিত বেকারকে শিক্ষকতার চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। গত ২৩ আগস্ট ২০১০ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এনসিটিই এক নির্দেশিকায় বলে, স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর এবং বিএড প্রশিক্ষণ না থাকলে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসা যাবে না। পূর্বতন সিপিএম সরকার এই নির্দেশিকা কার্যকর করার কথা বললেও নির্বাচনের জন্য পারেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে একটি কৌশলী অবস্থান নেয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব গত ১৩ জুলাই এক ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বিবৃতিতে বলেন, ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিএড এবং নন-বিএড উভয়ই পরীক্ষায় বসতে পারবে, তবে পাশ করলে বিএড-যুক্তরাই নিয়োগে অগ্রাধিকার পাবে। এসএসসি পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটি মনে করে, এই নির্দেশিকা বিএড ডিগ্রি আবশ্যিক করারই সামিল। স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশের কম নম্বর পাওয়া গ্র্যাজুয়েটরা পরীক্ষায় বসতে পারবে কি না শিক্ষাসচিব স্পষ্ট করে তাও বলেননি। ফলে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন একটা বিরাট অংশের ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বি এড ডিগ্রি এবং স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর আবশ্যিক করার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে এসএসসি পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটি। এই জনবিরোধী ফরমান বাতিলের দাবিতে গত আগস্টে মালদায় এসএসসি-র উত্তরাঞ্চলীয় দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন কমিটির রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, প্রভাত রায়, জহিদুল হক, মোসারফ হোসেন প্রমুখ।

১০ আগস্ট বাঁকুড়ার এস এস সি রিজিওনাল (পশ্চিমাঞ্চল) অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এর আগে বাঁকুড়া স্টেশন থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে মাচানতলায় অফিসের সামনে এসে পৌঁছায়। রাজ্য সম্পাদক দীপক পাত্রের নেতৃত্বে বাঁকুড়ার কৃপাসিন্ধু কর্মকার, পুরুলিয়ার নিতাই মাহাত, পশ্চিম মেদিনীপুরের পিন্টু বেরা, পূর্ব মেদিনীপুরের সিদ্ধার্থ শংকর রায় সহ এক প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেয়। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। বারাসতেও রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে ডেপুটেশন সংগঠিত হয়।

শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবিতে সম্মেলন

কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ২৮ আগস্ট ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড-এর সালানপুর এরিয়ার ডাবর (আর) কোলিয়ারির শ্রমিকদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিকরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মূলত নবম বেতন বোর্ডের ফয়সালা, আউটসোর্সিং বন্ধ করা, আইন অনুযায়ী সময়মতো বেতন প্রদান, মোট নিয়োগের ২৫ শতাংশ খনি শ্রমিকদের পোষ্য এবং ২৫ শতাংশ স্থানীয় বেকার যুবকদের মধ্য থেকে নেওয়া, খনি অভ্যন্তরে উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। সম্মেলন থেকে ১১ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।